দৈনিক ইত্তেফাক

অবাক করা হলেও কল্পকাহিনি নয়

প্রকাশ : ৩১ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

আবদুল মান্নান

কখনো কখনো অনেক সত্য ঘটনাকে বর্তমান সময়ে কল্পকাহিনি মনে হয়। বর্তমান প্রজন্মকে মাঝেমধ্যে আমাদের কালের শৈশবের স্মৃতি হাতড়ে কোনো কিছু বললে তা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। যখন বলি স্বাধীনতার আগে এই দেশে কোনো মধ্যবিত্ত ছিল না তখন তারা অবাক হয়। যখন বলি আমাদের দেশের সিংহভাগ পরিবারই নিম্নমধ্যবিত্ত ছিল, তাদের কাছে তখন তা অবিশ্বাস্য ঠেকে; কারণ এই প্রজন্মের অনেকেই কম করে হলেও ২৫ হাজার টাকা দামের মোবাইল ফোনের মালিক। একবার একটি ক্লাসে বলেছিলাম, কখনো কখনো সম্ভব হলে মা একটি ডিম অমলেট করে পাঁচ ভাইবোনের পাতে দিতেন। তখন তারা হাঁ হয়ে গিয়েছিল। তখনো আমার শেষের ভাইটির জন্ম হয়নি। ডিমটা আবার মায়ের পোষা মুরগির। বিক্রি করলে এক আনা দাম পাওয়া যাবে, যা সংসারের কাজে লাগবে। মুক্তিযুদ্ধের পর বাবাকে রিলিফের দুধ নেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের অফিসে লাইন দিতে হতো। নিজে লাইন দিয়ে রিলিফে দেওয়া শার্টের কাপড় নিয়েছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ফলাফল প্রকাশিত হলে আমার ফলাফল দেখে আমার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. আবদুল্লাহ ফারুক ও আর একজন সিনিয়র শিক্ষক ড. হাবিবুল্লাহ আমাকে বললেন, আমি যেন পরের সপ্তাহে বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দিই। বিনয়ের সঙ্গে তাদের বলি বাড়ির বড়ো সন্তান হিসেবে আমার পক্ষে ঢাকা থাকা সম্ভব নয়। শিকড়ের টানে চট্টগ্রাম যেতে চাই। তার পরও তারা আমাকে চাপ দিলেন, যেন আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি। ঢাকা থাকার তেমন একটা উৎসাহ আমার তেমন ছিল না। এর অনেক পর আমার একমাত্র কন্যা খুব ভালো ফলাফল করে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চাইল তখন তা হলো না। পরীক্ষার ফলাফল তার খুব ভালো ছিল। নিয়োগ বোর্ড তাকে ওই চাকুরির জন্য যোগ্য মনে না করে করল আরেকজনকে যার ফলাফল দ্বিতীয় শ্রেণিতে বাহাত্তরতম। তার স্ত্রীও একই বিভাগের শিক্ষক। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সেই সিলেকশন বাতিল করে দেয়। যে বিভাগটি আমি উপাচার্য থাকতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হয়েছিল সেখানে তার চাকরি হলো না। উপাচার্য পরে আমাকে জানিয়েছিলেন ছাত্রশিবিরের হুমকির কারণে তাকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কন্যা ঠিক করল বিসিএস পরীক্ষা দেবে। নিজের হাতে দুবার আবেদনপত্র জমা দিয়ে এসেছিল। একবারও প্রবেশপত্র পায়নি। তখন আমি মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান। মেয়ে কমনওলেথ বৃত্তির জন্য ইন্টারভিউ দেবে। আগেই বলে রেখেছি ও পরীক্ষা দিতে এলে যেন আর দশজনের মতো তাদের সঙ্গে বসতে দেওয়া হয় এবং কেউ যেন না জানে ও আমার কন্যা। বসার জায়গা না পেয়ে সিঁড়িতে ঘণ্টা দুই বসে তার ডাক পড়ে। বাছাইতে বাদ পড়ে যায় কন্যা। ওই বোর্ডের একাধিক সদস্য পরে বলে পুরো ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে। কী আর বলি কন্যাকে। মেয়ে ঠাট্টা করে বলে,

‘তোমার মেয়ে হয়ে আমার অপরাধই হয়েছে।’ সাড়ে চার বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকতে কখনো আমার সরকারি গাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়নি সে। এক বছর সে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছে। সকালের ট্রেনে অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গেছে। মেয়ে আমার চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষকতা পেশা শুরু অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য আবুল ফজল সাহেবের চাপে। তার দুই ছেলে আমার বন্ধু হওয়ার সুবাদে পাড়ার ‘সাহিত্য নিকেতন’-এ আমার নিত্য দিন আনাগোনা। তিনি বললেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে, কারণ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এখানে তেমন একটা কেউ আসতে চায় না। সেটি ১৯৭৩ সাল। ৬ আগস্ট ব্যবস্থাপনা বিভাগে যোগ দিলাম ৪৫০ টাকা বেতনে প্রভাষক হিসেবে। এই বেতনের সঙ্গে ১০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা আর ৩০ টাকা যাতায়াত ভাতা। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহনে শহর হতে আসা-যাওয়া করতে হতো ঐ ৩০ টাকা আর মিলত না। আমার প্রথম চাকরিতে যোগ দেওয়ার ছয় মাস পর সরকার থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি হলো, যারা এসএসসি হতে সকল পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে বা প্রথম শ্রেণিতে পাশ করেছে তাদের ৫০ টাকার একটি বাড়তি ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে। বেশ খোশ মেজাজে হিসাব নিয়ামক দপ্তরে এই ৫০ টাকা দাবি করে দরখাস্ত করলাম। দরখাস্তের ওপর উপহিসাব নিয়ামক সুফিয়ান সাহেব লিখে দিলেন, যেহেতু আমি প্রজ্ঞাপনের আগে যোগ দিয়েছি এই পঞ্চাশ টাকা আমি প্রাপ্য নই। হিসাব নিয়ামক আনিসুর রহমান বরাবর আবারও একটি আরজি পেশ করি। ফলাফল শূন্য। এই দুজন অফিসারের সততা নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন করতে পারেনি। আনিসুর রহমান পরে বুয়েটে হিসাব নিয়ামক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। সুফিয়ান সাহেব অবসরে যাওয়ার আগে আমার কাছে বিদায় নিতে আসেন। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বেশ বাকরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি আমার কাছে বিদায় চাইলেন। পরিস্থিতি একটু হালকা করার জন্য তাকে বলি ‘সুফিয়ান সাহেব, আমার ৫০ টাকা তো পেলাম না।’ সুফিয়ান সাহেব তার সিদ্ধান্তে এত বছর পরও অনড়। ‘স্যার আপনি ঐ ৫০ টাকার প্রাপ্য নন।’

জাতির জনকের প্রতি আমার ও আমার মতো অনেকেরই যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি বড়ো কারণ ছিল তিনি মানুষের চাহিদা সম্পর্কে বুঝতেন, সঠিক মানুষকে সঠিক জায়গায় পদায়ন করতেন আর মানুষকে সম্মান করতেন। ১৯৭৩ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ নিজ পায়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। চাহিদামতো সকলকে বেতন-ভাতা দেওয়ার মতো সামর্থ্য সরকারের নেই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক সরকারি ও আধাসরকারি অফিসে রেশন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। মাসে একজন দুই কেজি গম আর আধা কেজি চিনি পেত। শিক্ষকরা নির্দিষ্ট দিনে খালি বস্তা আর চটের ব্যাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বাসে উঠত। আসার সময় গম আর চিনি নিয়ে বাসে উঠতেন। কজন বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বঙ্গবন্ধুর এমন একটা ব্যবস্থার কথা জানেন?

আমার সৌভাগ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পর থেকেই প্রায় পরবর্তী ৩০ বছর কোনো না কোনো বিধিবদ্ধ পর্ষদের হয় নির্বাচিত অথবা মনোনীত সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দুই বার শিক্ষক সমিতির সভাপতি, একবার সাধারণ সম্পাদক। শেষে উপাচার্যের মতো কঠিন দায়িত্ব। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা সরকার গঠন করলে তিনি আমাকে খবর পাঠান এই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতে। প্রথমদিকে আমি কিছুটা হলেও ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, কারণ তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একটি মৌলবাদী ছাত্রসংগঠনের নিয়ন্ত্রণে বহু বছর ধরে। প্রধানমন্ত্রীর (তখন তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য) সঙ্গে দেখা করে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, এই দায়িত্ব নেওয়ার মতো আরো অনেকেই আছেন। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, ‘আমি তো অন্য কাউকে বলিনি।’ এই কথার পর আমার কী-বা বলার আছে? বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়াটাও অনেকটা একই রকম। বঙ্গবন্ধুকন্যার কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক কারণে ঋণী।

১৯৭৩ সালে দেশের চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পৃথক পৃথকভাবে চারটি আইন পাশ হয়, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য নিরঙ্কুশ একাডেমিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে বর্তমানে এই স্বায়ত্তশাসনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। অনেক কাজ হয় যার সঙ্গে স্বায়ত্তশাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইনসমূহ ১৯৭৭ সাল থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন শুরু হয়।

বর্তমানে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে পদোন্নতির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এই সুযোগ ছিল না। পদ সৃষ্টি না হলে যত যোগ্য শিক্ষকই হোক তার ওপরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক) একটি শূন্য পদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর পদে নিয়োগ পেলেন। তার সঙ্গে আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ড. আবদুল কাইয়ুম. ড. মাহমুদ শাহ কোরেশিসহ আরো অনেকে। সকলের যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু পদ তো একটা। তারা নিয়োগ না পেয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। অর্থনীতি বিভাগের ড. ইউনুস দীর্ঘদিন সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে চাকরি করেছেন কারণ তার বিভাগে প্রফেসরের পদ একটি, সেখানে ড. আতহার কর্মরত ছিলেন।

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত হলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর সাদউদ্দিন আহমেদ সভাপতি। তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সম্ভবত চতুর্থ হয়েছিলেন। রাজনৈতিক কারণে তাকে সেই সার্ভিসে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। দায়িত্ব নিয়েই কয়েকটি বিষয়ে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করি। যোগ্যতা থাকলে তাদের পদোন্নতির মাধ্যমে ওপরের পদে পদায়ন করা যাবে আর পদ সৃষ্টি ব্যাপারটা

শুধু মঞ্জুরি কমিশনের এক্তিয়ারে থাকবে। শিক্ষকদের পুস্তক ভাতা দিতে হবে। তখন যেসব শিক্ষক ক্যাম্পাসের বাইরে থাকতেন তাদের বাড়িভাড়া দেওয়া হতো বাড়িওয়ালার নামে। অনেকেই তো নিজের বাড়িতে থাকেন। তখন তিনি পরিবারের একজন সদস্যকে বাড়িওয়ালা বানিয়ে তার নামে চেক গ্রহণ করতেন। দাবি তোলা হলো বাড়িভাড়া শিক্ষককে দিতে হবে। শিক্ষকদের এই আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলল। শেষ পর্যন্ত এরশাদ সরকার সব দাবি মেনে নিলেন। আজ আমাদের যেসব সহকর্মী একটু কিছু হলেই ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেন, তারা কি এই সব ইতিহাস জানেন। তারা কি জানেন বাংলাদেশে বাণিজ্য অনুষদ বলে কোনো অনুষদের অস্তিত্ব ছিল না। ভর্তি হয়েছিলাম কলা অনুষদের অধীনে বাণিজ্য বিভাগে। ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন শুরু হলো পৃথক বাণিজ্য অনুষদের জন্য। নেতৃত্বে আবদুল মান্নান চৌধুরী (ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি), নাজিউর রহমান মঞ্জু (পরবর্তীকালে রাজনীতিবিদ, বর্তমানে প্রয়াত), আজিজুর রহমান, নাজমুল করিম ইসমাইল প্রমুখ সিনিয়র ছাত্ররা। পৃথক অনুষদের বাধা এসেছিল অর্থনীতি বিভাগ থেকে। তখন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। দীর্ঘ প্রায় এক বছরের আন্দোলন। শেষমেশ সৃষ্টি হলো পৃথক বাণিজ্য অনুষদ। কতজন জানে এই সব ইতিহাস? চিন্তা করছি স্মৃতিকথা লিখব। তখন হয়তো অনেক অবাক করার মতো ঘটনা লিখতে হবে। আবার কেউ কেউ বেজারও হতে পারেন। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছু সত্য কথা তো বলে যেতে হবে।

n **লেখক :বিশ্লেষক ও গবেষক্ও**

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।